ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 92- 101
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.274

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: সাহিত্যে নারীমুক্তি ভাবনা

রোকেয়া পারভীন, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, বাংলা বিভাগ, সামসি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.12.2025; Accepted: 31.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rokeya Sakhawat Hossain's name is permanently inscribed in golden letters in the history of Bengali literature and the narrative of the Bengali people's modern awakening. Her invaluable literary creations, efforts in spreading education, and work for social reform helped the Bengali nation attain fulfillment in many ways. At the core of her social and literary pursuits lay a steadfast commitment to women's liberation and awakening.

She was born into a backward Muslim society in Bengal, and the plight of women within that society deeply disturbed her. With the aim of remedying their miserable condition, she not only took up the pen but also actively engaged in building institutional and social frameworks. However, it would not be entirely accurate to say that her efforts were confined only to Muslim women; transcending religion, caste, and community, she dedicated her entire life and body of work to the liberation of all Bengali women.

Keywords: Women's Liberation, Social Reform, Feminist Thought, Educational Empowerment, Bengali Modernity

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির আধুনিক উত্তরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরস্থাবীভাবে লেখা আছে। বাঙালি জাতিকে নানাভাবে পূর্ণতা পেতে সাহায্য করেছে তাঁর অমূল্য সাহিত্য সৃষ্টি, শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কার কাজ। তাঁর সামাজিক- সাহিত্যিক কর্ম সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল নারীমুক্তি ও জাগরণের ব্রত। তিনি বাঙলার পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের নারীদের দুর্দশা তাঁকে বিচলিত করেছিল। তার দুরবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই একদিকে তিনি যেমন কলম হাতে তুলেছিলেন, তেমনই প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক গঠন কর্মেও হাত লাগিয়েছিলেন। তবে শুধু মুসলিম নারীদের জন্য বলা পুরোপুরি সত্য হবে না, তিনি ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালি নারীর মুক্তি সাধনায় উৎসর্গ করেছেন তাঁর জীবন ও সমগ্র কর্ম প্রবাহকে।

বর্তমান সময়ে তাঁকে 'বেগম রোকেয়া' নামেই সবাই চেনে। তাঁর সমকালে তিনি 'মিসেস আর. এস. হোসেন' নামেই পরিচিত ছিলেন। এই নামেই তিনি লেখালেখি বা সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল রোকেয়া খাতুন। ১৮৮০ খ্রীঃ বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে এক জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। যদিও রোকেয়ার জন্মের সময় জমিদারির জৌলুসে অনেকটা ভাটা পড়ে গিয়েছিল। রোকেয়ার বাবার নাম জহিরুদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ও

মায়ের নাম রাহাতুন্নেসা। রোকেয়ার মা ছাড়াও আবু আলী সাবেরের আরো তিন স্ত্রী ছিলেন। রাহাতুন্নেসার গর্ভে ইব্রাহিম সাবের, খলিল সাবের, করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হোমায়রা জন্মগ্রহণ করেন। রোকেয়ার শৈশব কেটেছে কঠোর পর্দা বা অবরোধের মধ্যে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ একেবারে ছিল না বললেই চলে। সেই সময় মুসলমান পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা বলতে টিয়া পাখির মতন কোরাণ শরীফ পাঠ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে জ্ঞান, রান্না, সেলাই বড়জোর দু-একটি উর্দু ফার্সি পুঁথি পড়া। এমনকি বাঙালি মুসলমান পুরুষরাও তৎকালে উর্দু ভাষায় কথা বলাকেই আভিজাত্য মনে করত। এমত অবস্থায় মেয়েদের জন্য বাংলা শেখা তো ছিল হারাম (নিষেধ)। রোকেয়ার বড়বোন করিমুন্নেসার বাল্যকালে বাংলা বই পড়ার প্রতি ভীষণ আগ্রহ ছিল। করিমুন্নেসা ছোট ভাইয়ের বাংলা পড়া শুনে শুনে তা মুখস্ত করতেন। মাটিতে আঁক কেটে কেটে বাংলা লিখতেও শিখেছিলেন। আবু আলী সাবেরের জমিদারসুলভ নানা দোষ থাকলেও, বিদ্যার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। দুই পুত্র ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবেরকে তিনি কোলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সমাজের প্রচলিত মতেরই অনুসারী ছিলেন।

রোকেয়ার শৈশব জীবন শুরু হয়েছিল দিদি করিমুন্নেসার কাছে। তাঁর কাছে বাংলা বর্ণপরিচয় শিখেছিলেন। দিদি করিমুন্নেসার আগ্রহ ও দাদা ইব্রাহিম সাবেরের উৎসাহ ও সহায়তায় পিতৃগৃহেই রোকেয়ার বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত। এই দাদাই বোনকে ছবির বই, ইংরেজি বই, বাংলা বই এনে দিতেন। বোন সেই বইগুলো আগ্রহ ভরে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন। শুধু তাই নয়, দেশ-বিদেশের শিক্ষিত মেয়েদের গল্প তাদের কঠিন পরিশ্রম করে উন্নত হওয়ার কথাও শুনাতেন। রোকেয়ার মধ্যে জ্ঞানের তৃষ্ণা ও সমাজ মনস্কতা তৈরির পেছনে দাদা ইব্রাহিম সাবেরের অবদান অনেক। শামশুন নাহার মাহমুদ অন্তরঙ্গ চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন-

> "পিতা বাংলা বা ইংরেজি শিক্ষার ঘোর বিরোধী। দিনের বেলা সকল সময় পড়াশোনার সুযোগ হয় না। ভ্রাতা –ভগ্নি অপেক্ষায় থাকেন কখন দিন গিয়া রাত্রি আসিবে। খাওয়া-দাওয়ার পর পিতা শুইতে গেলে দুই ভাই-বোনে বসেন পুঁথিপত্র লইয়া। গভীর রাতে পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় আর সেই সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে দুটি কিশোর- কিশোরীর শয়নকক্ষে স্থিমিত দীপশিখা। চোখ মুছিয়া সেই নীরব নিশীথে দুই ভাই-বোনে মোমবাতির পাশে বসেন। জ্ঞান দান করেন ভাই আর বালিকা ভগ্নী সেই জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করেন।"[১]

রোকেয়ার বিদ্যাচর্চার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় বিয়ের পর। মাত্র ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয় বিহারের ভাগলপুর অধিবাসী বিপত্নীক উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত , স্পষ্টবাদী, তেজস্বী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, কুসংস্কারমুক্ত উদার ও শিক্ষানুরাগী মানুষ। তিনি পেশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ফলে এই রকম একজন মানুষের সংস্পর্শে এসে রোকেয়ার বিদ্যাচর্চা নতুনভাবে নতুন উদ্যমে শুরু হয়। স্ত্রীর শিক্ষার পথে তিনি তো বাধা ছিলেন না বরং স্ত্রীর মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার বিকাশে সহায়তা করা তাঁরই কর্তব্য, এটা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। ডেপুটি সাহেব হওয়ায় বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে যে সমস্ত ইংরেজি চিঠিপত্র পেতেন, প্রায় সবগুলি চিঠি রোকেয়াকে পড়াতেন এবং চিঠির উত্তর নিজে Dictate করে তাঁকে দিয়ে লেখাতেন। স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের সান্নিধ্যে ও উৎসাহে তাঁর সাহিত্যচর্চা, লেখায় হাতে খড়ি এবং সফলতাও। রোকেয়া তা নিজেও স্বীকার করেছেন,-

> "আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনোই প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।"[২]

রোকেয়ার দাম্পত্য জীবন ছিল মাত্র ১৩ বছরের। স্বামীর জীবদ্দশাতেই প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি রচিত হয়। এমনকি রোকেয়ার কৃতিত্বে যে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল তৈরি হয়, সেটাও সাখাওয়াত হোসেনেরই

পরিকল্পনা। পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়টির জন্য তিনি দশ হাজার টাকাও রেখে যান। রোকেয়ার রোকেয়া হয়ে ওঠার পেছনে দাদা ইব্রাহিম, দিদি করিমুন্নেসা ও স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের ভূমিকা অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। তিনি নিজেও বার বার সেটার সকৃতজ্ঞ উল্লেখ করেছেন।

রোকেয়ার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নারীমুক্তি। সে সময় তিনি ভালোভাবে বুঝে ছিলেন যে, নারীকে তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মুক্তি অর্জন করতে হবে। আর শিক্ষাই হলো তার স্বনির্ভরতার চাবিকাঠি। স্বভাবতই তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নারীমুক্তি, সমানাধিকার ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি মুসলিম সমাজে সমাজ সংস্কারক ও লেখক-চিন্তক পাশাপাশি এই দুই ভূমিকায় সমান সফলতার পরিচয় রোকেয়া ছাড়া আর তেমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা শুরু করার আগেই মীর মোশারফের 'জমিদার দর্পণ', 'বিষাদ সিন্ধু', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র মত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাঁর সম সময়ে সেখ আবদুর রহিম, মোজাম্মেল হক, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকগণ সাহিত্যচর্চায় রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন লেখক তাঁদের লেখায় মুসলমান সমাজের নানা কুসংস্কার জড়তাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন। এমনকি নারীর অবরোধমুক্তি ও তাদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ রোকেয়ার মতো করে সেই বিষয়গুলি অনুধাবন করে উপস্থাপন করতে পারেননি। একজন নারীর অবস্থান একজন নারী যেভাবে বুঝতে পারবে, তা বোঝা একজন পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পুরুষের দৃষ্টিতে পুরুষের কলমে রচিত হয়েছে তাঁর কর্মজগৎ, প্রেমের জগৎ, আনন্দ-বিষাদের জগৎ, হয়তো বা সে সব জগৎ গড়া হয়েছে পুরুষের সুবিধাবাদের বিধিনিষেধ দিয়েই। মেয়েরা কি নিজের কলমে লিখে রেখেছে নিজেদের অনুক্রমিক ইতিহাস? তাই অন্দরের এই ইতিহাস লেখার জন্য অবরোধ ঘোমটার আড়াল থেকে সাহিত্যিকের কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন রোকেয়া।

রোকেয়ার মোট গ্রন্থের সংখ্যা প্রকাশ কাল অনুযায়ী এইগুলি হল যথাক্রমে মতিচূর (প্রথম খন্ড), সুলতানাজ ড্রিম, মতিচূর (দ্বিতীয় খন্ড), পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী। এইগুলো ছাড়াও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আরও কিছু প্রবন্ধ, নকশাজাতীয় রচনা ও কয়েকটি কবিতা বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ও আবদুল কাদির সম্পাদিত 'রোকেয়ার রচনাবলী'তে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্নজনকে লেখা রোকেয়ার বাংলা-ইংরেজি চিঠি-পত্র। তাঁর জীবন সাধনাকে বোঝার জন্য চিঠিগুলোর গুরত্ব অপরিসীম।

রোকেয়ার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'মতিচূর' (প্রথম খন্ড)। এই গ্রন্থেই রয়েছে নারীজাতির দুরবস্থা ও অধিকার বিষয়ে সবচেয়ে বিতর্কিতমূলক প্রবন্ধ 'স্ত্রীজাতির অবনতি'। ১৯০৩ সালে প্রবন্ধটি প্রথম 'অলংকার না Badge of Slavery' শিরোনামে গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মাসিক 'মহিলা' পত্রিকায় পরপর তিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। নারীমুক্তি সম্পর্কিত ধারনাকে তিনি প্রথম এই প্রবন্ধেই তুলে ধরেন। পরবর্তী অন্যান্য রচনায় তাঁর এই মূল বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি ও সম্প্রসারণ করেছেন। পরে ১৩১১ সালের ভাদ্র সংখ্যায় সৈয়দ একদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকায় 'আমাদের অবনতী' নামে পুণর্মূদ্রিত হয়।

সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই স্ত্রীজাতির অবনতি লক্ষ্য করা যায়। নারীরা পুরুষের সহচারী বা সহধর্মিনী না হয়ে দাসী হয়েছে। এদের অক্ষম ও অকর্মন্য ভেবে পুরুষজাতি এদের সাহায্য করতে থাকে। সাহায্য পেতে পেতে ক্রমে তারা আরও অকর্মন্য হতে থাকে এবং অনুগ্রহ গ্রহণ করতে সংকোচবোধ করে না। প্রচলিত মনগড়া ধর্মের ব্যাখ্যা নারীজাতির উন্নতি ও প্রকৃত শিক্ষায় বাধা হয়েছে। রোকেয়া ধর্ম সম্পর্কিত অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন-

> "আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে 'ঈশ্বরের আদেশপত্র' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু নহে।"[৩]

তাঁর মনে হয়েছে নারীদের উচিৎ নিজ হাতে নিজের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করা। তাই নারীদের জাগ্রত হতে হবে। সাংসারিক জীবনে পুরুষের পাশাপাশি চলার ইচ্ছা ও দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক। তারা যে গোলাম জাতি নয়, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নারীরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। যেমন কোন মানুষের এক পা বেঁধে রাখলে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কতদূর চলবে? পুরুষের স্বার্থ ও নারীদের স্বার্থ একই। যেমন একটি শিশুর জন্য বাবা-মা দুজনেরই সমান দরকার। নারীদের পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য রোকেয়া নারীদের শিক্ষা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও বিশেষ করে নারীদের চেষ্টার উপর বিশেষভাবে গুরত্ব দিয়েছেন। সে সময় এই দৃঢ় মনোভাব পোষণ করা কতটা সাহসিকতার পরিচায়ক, তা হয়তো আমরা এখন উপলব্ধি করতে পারব না। এমন সত্য তীক্ষ্ণ বাক্যবান সমকালীন সমাজ সহ্য করতে পারেনি বলেই প্রবন্ধটি এতটা বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

'অর্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে লেখিকা স্ত্রীদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন। ইংরেজিতে স্ত্রীকে পার্টনার বা বেটার হাফ বলে থাকে। আবার শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে একই শরীরের অঙ্গ স্বরূপ ভাবলেও, সমাজ কি তা মনে করে? যদিও নারী ও পুরুষ উভয়েই একই বস্তুর অঙ্গ বিশেষ। একটা গাড়ির দুই চাকা। তাই একটিকে ছেড়ে অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করতে পারে না।

কিন্তু সমাজে নারীদের মানসিক ও শারীরিকভাবে দমিয়ে রাখে। তারা নতমস্তকে বিশ্বাস করে ফেলে যে, তারা এসবে উপযুক্ত নয়। আবার শিক্ষা, উপার্জন যখন যেখানেই তারা নিজেদের প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে, তখনই সমাজ কড়া হাতে তাদের নিরুৎসাহিত করেছে। কিন্তু নারী জীবনের এসব বাস্তব বাধার কথা যখন ভুলে যান সমালোচকেরা, তখন বলেন- মেয়েদের বুদ্ধিই নেই পুরুষের মতো। এমনকি রবীন্দ্রনাথও বলেন রাণী চন্দকে-

> "হাজার হোক, এটা মানতেই হবে, পুরুষের ও মেয়েদের build সব দিক থেকেই আলাদা। পুরুষের brain, তার শক্তি ঢের বেশি মজবুত। ধর না কেন, আমি যদি আমার ন'দিদি হতুম, তবে কি এমনি আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম? সংসারের বাধাবিঘ্ন ছেড়ে দে, তা না হলেও, মেয়েদের brain এতটা কাজ করতেই পারে না।"[৪]

ভারতীয় সমাজ নারীকে আরাধ্য দেবতায় অসীন করলেও নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান পুরুষ আজও কি দিতে পেরেছে? আদিকাল থেকেই সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থেকেই গেছে। সমাজ রামচন্দ্রকে আদর্শ স্বামী আর সীতাকে আদর্শ স্ত্রী বললেও, তা আমাদের চোখে এক প্রকার ছলনা ছাড়া কিছু নই। তার কারণও প্রাবন্ধিক যুক্তি দিয়ে বলেছেন-

> "সীতা রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী রাণী, প্রণয়নী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক-সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাতে প্রকাশ পায় যে একটি পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালোবাসতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে ব্যক্তি চুরি করিয়েছিল, তাহার প্রতি খড়গহস্ত হইতে পারে; হারান পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলে দিতে পারে- কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারেনা, কারণ হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পৌত্তলিকা অচেতন পদার্থ ! বালক

> তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি ধূসরিত হইয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে পারে!! রামচন্দ্র স্বামীত্বের ষোল আনা পরিচয় দিয়েছে। আর সীতা? কেবল প্রভু রামের সহিত বন যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেননা, বুঝিয়া কার্য করিতে গেলে স্বামীত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটান যাইতো না; সীতার অমন পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের পদাঘাতে দলিত ও চূর্ণ করিতে পারা যাইতো না!''[৫]

পুরুষের এহেন আচরণে নারীরা ধীরে ধীরে অন্ধ কূপে ডুবে গেছে। এখান থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষা। আর তার জন্য চাই উপযুক্ত বহুল পরিমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমকালে তার বড় অভাব ছিল। আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বাঙালি, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম ও উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের থাকলেও, বাঙালি মুসলমান মেয়েদের সেই সুযোগ তেমন ছিল না। যদিও পশ্চিমাঞ্চলের (লাহোর, মুম্বাই, আলিগড়) মুসলমান মেয়েদের সুযোগ কিছুটা হলেও ছিল। অন্ধকারের মধ্যে 'আশা-জ্যোতি' জ্বালিয়ে ছিল আলীগড়ে মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষালয় তৈরি করে। তাঁর 'আশা-জ্যোতিঃ' প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে লেখিকা ভবিষ্যৎ মহীরুহের সম্ভাবনাকে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই স্কুলটি হবে জেনানা মেয়েদের ভাবি কলেজের মাতামহী বা প্রমাতামহী। আসলে সেই সময়ে বেথুন কলেজে কেবলমাত্র ভদ্র হিন্দু মেয়েদের পড়ার সুযোগ ছিল। সেখানে মুসলিম মেয়েদের প্রবেশ একেবারে ছিল নিষিদ্ধ। আশাহত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আশার জ্যোতি দেখেছিলেন আলীগড়ে 'মেয়েদের কলেজের মাতামহিকে' দেখে। সুযোগ পেলে দূরে পাড়ি দিয়েও মুসলিম মেয়েরা পড়তে পারবে। অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে, একবার আদিজননী জ্ঞান ফল চয়ন করায় পিতা আদমকে স্বর্গচ্যুত হতে হয়েছে, আবার বঙ্গ জননীরা জ্ঞানলাভে অগ্রসর হলে পুরুষদের গৃহচ্যুত হতে হবে। যদি আদিমাতা এই হয়, তবে নিষ্কর্ম অলস জীবনের স্বর্গভোগ পরিত্যাগ না করলে মানবজাতি ধর্মবিশ্বাসরূপ অমূল্যরত্ন পেত কোথায়? স্বর্গবাসী আদম অপেক্ষা মর্তবাসী দরবেশ মনসুর বেশি সুখী ছিলেন না কি?

মুসলিম নারীজাতির শিক্ষার জন্য এটি একটি শুভ উদ্যোগ। সেই উদ্যোগকে সফলকাম করতে অবলা নারীদের জাগরণ ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সংখ্যায় একজন দুজন হলে হবে না, সকলকে এই মাহেন্দ্রক্ষণে উদ্যোগী হতে হবে। তবেই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। তাই প্রবন্ধের শেষে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন-

> "সুদীর্ঘ নৈরাশ্য ও যামিনীর শেষে আশা-শুকতারা উদয় হইল। এমন সুপ্রভাতে যে নিদ্রিত থাকে, তাহার দুর্ভাগ্য। তাই বলি ভগিনী! চাহিয়া দেখুন- ঐ দূরে আশা জ্যোতিঃ।''[৬]

মুসলমান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে কটাক্ষ করে 'সিসেম ফাঁক' প্রবন্ধটি 'সওগাত' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মুসলমান সমাজ স্ত্রী শিক্ষাকে নাকোচ করে উচ্চস্তরে পৌঁছাতে চেয়েছে। সমাজের গাড়ির চাকার একটি চাকাকে উপেক্ষা করে কোনোভাবেই সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, তা প্রাবন্ধিক বারবার বিভিন্ন লেখনীতে উল্লেখ করেছেন। মূল সত্যটি বুঝতে যদিও সমাজের অনেকটা সময় লেগেছে। দেরিতে হলেও এখন মুসলমান সমাজ বুঝেছে যে, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত এই অনুন্নত সমাজের উন্নতির আশা নেই। চারিদিকে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা হচ্ছে, জেলায় জেলায় ও গ্রামে গ্রামে মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়েছে। মহিলা সমিতি, মহিলা ক্লাব গুলিতে তাদের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অধিবেশনে পর্দানশীল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রেখে তাদের নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। পুরুষেরা এখন বুঝেছে-

"না জাগলে সব ভারত- ললনা' এ ভারত আর জাগিবে না।"[৭]

'সিসেম ফাঁক' প্রবন্ধের আলিবাবা ও কাশেমের বহু পরিচিত গল্পটি এখানে আলোচনা না করলে শিল্পীর প্রতিভার অভিনবত্ব আমাদের কাছে অজানা থেকে যাবে। গল্পটিতে এক অন্য নতুন অর্থ সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন। আলিবাবার কাছে গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান নিয়ে কাশেম গুহায় প্রবেশ করে। থলি ভরে মূল্যবান প্রস্তর ও আশরাফি নেয়। কিন্তু গুহার বাইরে আসার মূল মন্ত্রটি 'সিসেম ফাঁক' ভুলে গেছে। সে মন্ত্রটি কোনোভাবেই মনে করতে পারে না। ধনরত্ন পেলেও মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সেখানে ধনরত্ন মূল্যহীন হয়ে যায়। একইভাবে মুসলমান সমাজও নারীদের শিক্ষা পরিহার করে সমাজের মুক্তি ও প্রগতি চেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন হয়নি। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাই বলেন যে, গৃহে যে গৃহিণী, ধর্মে যে সহধর্মিনী, ভাবি বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যতের আশা ভরসার যে রক্ষায়িত্রী ও পালনকর্ত্রী তাকে সঙ্গে না নিলে গন্তব্যস্থানে পুরুষ কখনো একা পৌঁছাতে পারবে না।

অন্যান্য সাহিত্যের মত কবিতাতেও তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। শিক্ষা সংস্কৃতি আর মর্যাদাপূর্ণ জীবনচর্চার মাধ্যমে রোকেয়া নারী সমাজকে সফল করে তোলার অভূতপূর্ব সওগাত আমৃত্যু বাঙালির ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'সওগাত' কবিতায় তারই পরিচয় পাওয়া যায়। নারী সমাজকে জাগ্রত করার জন্য 'সুপ্রভাত' বলে তিনি জাগরণী গান শুনিয়েছেন-

"জাগো বঙ্গবাসি।
দেখ, কে দুয়ারে
অতি ধীরে ধীরে করে করাঘাত
ঐ শুন শুন!
কেবা তোমাদের
সুমধুর স্বরে বলে 'সুপ্রভাত'।
অলস রজনী
এবে পোহাইল,
আশার আলোকে হাসে দিননাথ।
শিশির সিক্ত
কুসুম তুলিয়া
ডালা ভরে নিয়ে এসেছে 'সওগাত'।"[৮]

রোকেয়ার একমাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ'। উপন্যাসটিতে তিনি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাবলম্বনের কথা বলেছেন। 'তারিণী ভবন' নামক একটি নারী আশ্রমকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনি। তারিণী ভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী দীণ-তারিণী ও উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকার মধ্যে আসলে লেখিকার নিজ জীবনের ছায়াপাত লক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসে তিনি নারীর আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরশীলতার উপর গুরত্ব দিয়েছেন। তাই উপন্যাসের অনেক চরিত্র (সাকিনা, জয়নব) স্বামীর ঘর না করে 'তারিণী ভবনে' আশ্রয় নিয়ে স্বনির্ভর হয়েছে। তারা সমাজকে বুঝিয়ে দিতে চাই বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নয়। উপন্যাসের মূল বিষয় হল নারী নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে। সেটাই তার জীবনের লক্ষ্য হবে। বিয়েকে সে জীবনের মোক্ষ মনে না করে। সে নিজের চলার পথ নিজেই স্থির করবে। সে তার নিজের শক্তি সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয় অর্জন করুক। অন্ন নির্ভর জীবন অবমাননাকর। নারী সে অবমাননা মেনে নিবে কেন? যে শক্তি সে স্বামীর সংসার

চালাতে ব্যয় করে, সেই শক্তিকে সে স্বনির্ভর হওয়ার কাজে লাগাক। আর একদিন সে লক্ষ্যে পৌঁছাবেই। সেটাই হোক তাদের সাধনা।

উপন্যাসের রসুলপুরের জমিদার হাজী হাবিব আলমের ভাইপো লতিফের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার জমিদার সোলেমানের বোন জয়নবের আকদবস্ত (বিয়ের চুক্তি) হয়। দুই পরিবারের মধ্যে স্থির হয়-লতিফ ব্যারিস্টার হয়ে তিন বছর পরে বিদেশ থেকে ফিরে এলে সম্প্রদান করা হবে। কিন্তু হাজী সাহেব ব্যারিস্টার ভাইপোকে কন্যাদায়গ্রস্থদের কাছে একটি টোপ স্বরূপ মনে করলেন। বিয়ের আগেই জয়নবের প্রাপ্য সম্পত্তি তার নামে লিখে দেওয়ার জন্য সোলেমানকে চিঠি দিলেন। সোলেমান নাবালিকা বোনের নামে কোন সম্পত্তি লিখে দিতে রাজি হলেন না। তখন সালেহা নামে এক জমিদার কন্যার সঙ্গে লতিফের বিয়ে হয়। লফিত ব্যারিস্টার হয়েও নিজের কোন মতামতকে প্রতিষ্ঠা না করে গুরুজন যাকে বিয়ে করতে বললেন, তাকেই বিয়ে করে নিল। উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা ওরফে জয়নব লতিফের সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার জন্য লতিফ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয় জানার পরও তার সংসারে যেতে রাজি হয়নি। তার আত্মমর্যাদাবোধ অন্তরাবেগের উপর জয়ী হয়েছে। দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন-

> "একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে।.....সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না পাওয়ার জন্য 'পদাঘাতে বিতাড়িত' হইয়াছিলাম, সে অবমাননা কি করিয়া ভুলিবো? তাঁহারা আমার সম্পত্তি চাইহাছেন, আমাকে চাহেন নাই। আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন?"[৯]

যেখানে প্রতিষ্ঠিত লেখক রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল বিয়ের পনের বছর পর পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে প্রথম উপলব্ধি করে যে, সংসারে মেজো বউ ছাড়াও জগতের সঙ্গে তার অন্য সম্বন্ধ আছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মুক্তির পথ হিসেবে খুঁজে নেয় মীরা বাইয়ের সাধনার আদর্শের মধ্যে, মেরে তো গিরিধর গোপাল/ দুসরো না কোই। আবার 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী স্বামীকে ত্যাগ করেও সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য আবার সেই স্বামী গৃহেই ফিরে যায়, যে স্বামীকে সে মন থেকে একদিনের জন্যেও শ্রদ্ধা করতে পারেনি। ইবসেনের 'A Doll's House' নাটকে তিন সন্তানের জননী নোরা আট বছর সংসার করার পর স্বামীগৃহ ত্যাগ করে। Leo Tolstoy এর 'Anna Karenina' উপন্যাসের আন্নাও মুক্তি চেয়েছিল। মুক্তি বলতে সে বুঝেছিল সরে যাওয়া। কিন্তু সরে যাওয়া তো আসলে হেরে যাওয়ার নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার মালতীও জিততে চায়। যদিও সে জানে 'বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে/ দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি/ সে বর আমি পাব না।' অন্যদিকে রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের সিদ্দিকা বিজয়নী। কারণ সবার সঙ্গে সবাইকে নিয়ে জেতার প্রয়াস। তাই তাঁর মুখে জীবনের গন্তব্যপথ সম্পর্কে শুনতে পাই-

> "আমি আজীবন তারিণী ভবনের সেবা করিয়া নারী জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মুলোচ্ছেদ করিব।..... মুসলমান সমাজের ললনাবৃন্দকে জাগ্রত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"[১০]

রোকেয়ার সৃষ্ট আধুনিকচেতা সিদ্দিকা লতিফকে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখান করেছে। শেষে সিদ্দিকা নিজস্ব এলাকা চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে সে জমিদারি দেখাশোনা করবে এবং নাবালক মাতৃ-পিতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালন করবে। সেই সঙ্গে পতিত মুসলমান সমাজের ললনাবৃন্দকে জাগ্রত করার চেষ্টা করবে। রোকেয়া সিদ্দিকার মধ্যে দিয়ে নিজের মনে লুকিয়ে থাকা ভাবনাকেই প্রতিফলিত করেছেন। যে সমাজের কাছে নারী অপমানিত, উপেক্ষিত হয়েছে, সেই সমাজের কাছে সে কোন প্রত্যাশা করেনি। যে সমাজ বস্তু

মূল্যে নারীকে ওজন করেছে, তার প্রতিনিধিকে স্পষ্টভাবে সে জানিয়ে দিয়েছে "তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি"[১১] (তদেব, পৃ-৩০৫)। পুরুষ যদি নারীকে অপমান করে নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারে, তবে সেই অপমানিত নারী কেন সেই পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারবে না ?

শুধুমাত্র বাংলা রচনাতে নয়, ইংরেজি রচনাতেও রোকেয়া কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে 'Sultana's Dream' অন্যতম। বিশেষত এখানে তিনি যে বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন তা আজও আমাদের বিস্মিত করে। কল্পবিজ্ঞান রচনাটি পড়ে ভাগলপুরের কমিশনার মিষ্টার ম্যাকফারসন মন্তব্য করেছিলেন-

> "The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English."[১২]

'Sultana's Dream' রচনায় রোকেয়া এক 'নারীস্থান' এর উন্নতির কল্পনা করেছেন যেখানে নারীরা সকল অর্থেই স্বাধীন। 'নারীস্থান' এর উন্নতির মূলে রয়েছে নারীদের স্বাধীনতা আর জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ। 'Sultana's Dream'- এ যে নারী রাজত্বের কথা বলা হয়েছে, তা ঠিক পুরুষশাসিত সমাজের বিপরীত। এখানে নারীরা সমস্ত ক্ষমতার অধিকারিণী। তারাই বাইরের কর্মবহুল জীবনের অংশীদার। সুলতানার রাজত্বে নারীই নিয়ন্ত্রন শক্তি। পুরুষ অন্তঃপুরের বাসিন্দা। বাস্তব সংসারে রমণীদের পর্দার আড়ালে থাকতে হয়। তাদের ইচ্ছা থাকলেও সামাজিক রীতি ভেঙে তারা পুরুষদের মত বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। এতে নারীর কিরকম উপলব্ধি হয়, তারই প্রতিশোধ নিতে স্বপ্নের জগতে রোকেয়া 'মাতৃতান্ত্রিক' সমাজব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত করেন, যা বাস্তবে কোন সময়ে কোথাও ছিল না। এই কল্পকাহিনীর রূপ এক নিঃশ্বাসে পড়ে স্বামী সাখাওয়াত হোসেন বলেছিলেন, 'A terrible revenge' (ভয়ংকর প্রতিশোধ)[১৩]

সামাজিক বিধি ব্যবস্থার উপর নারীদের কোন হাত থাকে না। পুরুষজাতি প্রভু- তারা সব সুখ, সুবিধা ও প্রভুত্ব নিজেদের জন্য হস্তগত করে ফেলেছে। আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ খাঁচায় আবদ্ধ রাখে। উড়তে শেখার আগেই তাদের ডানা কেটে দেয়। তাছাড়া সামাজিক রীতি-নীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সুলতানার স্বপ্নে নারী তার আপন বুদ্ধি বলে পায়ের বেড়ি কেটে বাইরে বেরিয়ে আসে। কেবল শারীরিক বল বেশি থাকলেই কেউ প্রভুত্ব করবে, এটা তারা অস্বীকার করে। তারা ভাবে মানুষ অপেক্ষা সিংহ শক্তিশালী হলেও, সে মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। তেমনি পুরুষ শক্তিতে এগিয়ে থাকুক কিন্তু নারীরা বুদ্ধি বলে তাদের ওপর প্রভুত্ব করবে। পুরুষরা কাজে বেশি সময় নেয়, তারা অলসভাবে সময় কাটায়, অন্যদিকে নারী যত্ন সহকারে নিজ দায়িত্ব পালন করে কম সময়ে নিপুন কাজ করে। সুলতানা রাজ্যে পুরুষের ক্ষমতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। 'জেনানা'-র পরিবর্তে 'মর্দানা' প্রথা চালু হল। লেখিকা জোর দিলেন নারীর বুদ্ধিভিত্তিক শক্তিমত্তায়।

কল্প কাহিনীটির দ্বিতীয় অংশের সৌরশক্তি কেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিটিও সেকালের বিজ্ঞান জগতে ছিল অভিনব। লেখিকার অনেক ভাবনার দিক এখনো গবেষণার অপেক্ষা রাখে। সুলতানার মধ্য দিয়ে তিনি যে স্বপ্ন রাজ্য তৈরি করেছিলেন, সেখানে সৌরতাপ দিয়ে রান্না করা, সৌরতাপ দিয়ে শত্রু নিধন করা, বেলুনের মাধ্যমে বায়ুর আর্দ্রতা শুষে নিয়ে বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা, বায়ুযানে ভ্রমণ করা সবই অভিনব। সুলতানা স্বপ্নের পৃষ্ঠপোষক যেহেতু স্বয়ং মহারানী, সেখানে আর কোন অভাব থাকতে পারে না। অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা করে। রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা প্রিন্সিপাল একটি অভিনব বেলুন নির্মাণ করলেন, এই বেলুনে কতগুলি নলযুক্ত করা হল। বেলুনটিকে শূন্যে মেঘের উপর স্থাপন করে বায়ুর আর্দ্রতা বেলুনে সংগ্রহ করে জলধরকে ফাঁকি দিয়ে বৃষ্টিজল করায়ত্ত করল। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী

লেডি প্রিন্সিপাল প্রাকৃতিক ঝড়-বৃষ্টি নিবারণ করলেন। এরপর রাজ্যের অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প দিনের মধ্যে একটি যন্ত্র তৈরি করে, যার দ্বারা সূর্যতাপ সংগ্রহ করা যায়। শুধু তাই নয়, প্রচুর পরিমাণে সূর্যের তাপ সংগ্রহ করে রাখা যায় এবং ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যবহার করে পুরুষদের রণে হারিয়েছিল এবং তখন থেকে পুরুষরা অন্তঃপুরের বাসিন্দা হলো আর কখনো বাইরে আসার চেষ্টা করেনি। তাদের বায়ুযানটিও খুব অভিনব ছিল। একখন্ড তক্তা ওজন অনুপাতে হাইড্রোজেন পূর্ণ গোলা এবং বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত দুটি পাখার মত ফলা সংযুক্ত করে বায়ুভরে উড়ে যায়।

ইবসেনের 'A Doll's House' নাটকে এক বিদ্রোহী নারীর একক অভিযাত্রা- (Nora- 'I have no idea what's going to become of me') স্বরূপের সন্ধানে, অনিশ্চিতের পথে,/ আর Sultana's Dream-এ এসে যেন বহুর মিলিত প্রয়াসে তার মহতী চরিতার্থতা খুঁজে পায়। সাহিত্য মূল্যায়নে হয়তো 'A Doll's House' এর তুলনীয় নয়। এমনকি রোকেয়া এখানে নারীস্থানের যে কল্পনা করেছেন বিশ্বসাহিত্যে তাও একেবারে নতুন বা অভিনব নয়। তবুও উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে Sultana's Dream এর সমান্তরাল রচনা বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশি নেই বললেই চলে। সমাজে নারীর অবস্থা ও অধিকার সম্পর্কে চিন্তার পথ ধরেই হয়তো রোকেয়া এই বিজ্ঞান মনস্কতার দ্বারে উপনীত হয়েছিলেন।

রোকেয়ার আগে বা তাঁর সমসাময়িককালে বাঙালি মুসলমান লেখকদের মধ্যে সৈয়দ এমদাদ আলী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, ডা: লুৎফর রহমান প্রমুখ স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা কোথাও যেন শিক্ষার উপযোগিতাকে শেষ পর্যন্ত সীমায়িত রাখতে চেয়েছেন আদর্শ গৃহিনী ও মাতা তৈরি করার মধ্যে। রোকেয়ার মতো তাঁরা বলতে পারেননি-

> "আমি চাই সেই শিক্ষা – যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে।..... তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।"[১৪]

পদ্মরাগ উপন্যাসেও তারিণী ভবনের শিক্ষা প্রণালীর যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতেও দেখা যায়-

> "বিশেষতঃ তাহারা আত্মনির্ভরশীল হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়।"[১৫]

তিনি তাঁর প্রায় সব রচনায় বলেছেন যে, উন্নতির জন্য উচ্চ শিক্ষা চাই। নারীরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হলে সমাজও উন্নত হবে না। যতদিন তারা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। নারীদের সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করতে হবে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে নারীর অধিকার বিষয়ক আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা মেরি ওলসটন ক্রাফটের 'A Vindication of the Rights of Women' এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের 'The Subjection of Women'। রোকেয়ার রচনাবলীতে এই দুজন পূর্বসূরীর রচনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না কিন্তু মেরি ওলসটন ক্রাফটের বক্তব্যের সঙ্গে রোকেয়ার বিভিন্ন বক্তব্যের মিল সহজেই চোখে পড়ে। মেরি ওলসটন ক্রাফটের মতে নারী ও পুরুষের পার্থক্যের জন্য দায়ী উভয়ের শিক্ষার পার্থক্য এবং সামাজিক প্রথা সমূহ। রোকেয়াও এই যৌক্তিক দিক থেকেই তাঁর বিভিন্ন লেখায় সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকারের প্রশ্নটিকে নিজে দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তবে অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের মিল যাই হোক, নিজ সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতনতা ও নিজস্ব দায়বদ্ধতাই ছিল মূল প্রেরণা, আর শেষ পর্যন্ত তাই তাঁকে চালিত করেছে। রোকেয়া তাঁর লেখনির মধ্যে

প্রাগ্রসর মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, সাহসী ও স্পষ্ট উচ্চারন করেছেন, সেখানে তাঁর সমকালে তিনি একক ও অনন্য।

তথ্যসূত্র:

১। নাহার, শামসুন। রোকেয়া জীবনী। নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮।
২। নাহার, মীরাতুন সম্পাদিত। রোকেয়া রচনা সমগ্র। বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা ২০০১, পৃ. ৪১৭।
৩। নবনূর, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১১, উদ্ধৃত 'সম্পাদকের নিবেদন', রো, র, পৃ. ১১-১৩।
৪। চন্দ, রাণী। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২৯।
৫। রাউফ, আবদুল সম্পাদিত। রোকেয়া রচনাসমগ্র। বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮, পৃ. ৩০-৩১।
৬। তদেব, পৃ. ৩৭৯।
৭। তদেব, পৃ. ৩৯১।
৮। তদেব, পৃ. ৮৫৯।
৯। তদেব, পৃ. ১৯৯।
১০। তদেব, পৃ. ২৯৮।
১১। তদেব, পৃ. ৩০৫।
১২। তদেব, পৃ. ৫৭৪।
১৩। তদেব, পৃ. ৪৪৯।
১৪। তদেব, পৃ. ৪৩৪।
১৫। তদেব, পৃ. ২০৬।